© 2018 IJNRD | Volume 3, Issue 6 June 2018 | ISSN: 2456-4184

রবীন্দ্রানুসারী হয়েও স্বমহিমায় অনন্য দুই কবিঃ পল্লীপ্রেমী কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায়

ড. অন্তরা চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়,
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

KEY WORDS-

রবীন্দ্র -অনুগামী, প্রকৃতি-প্রেমিক, প্রেম ও ভক্তির সাধক, আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যে অননুকরণীয়।

ABSTRACT-

প্রাচীন চর্যাগীতি কোষ থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক কবিতা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত কাব্য বা কবিতা বিভাগ বিচিত্র বিষয়ে, বিচিত্র রূপে, আঙ্গিকে, ছন্দে ও ব্যঞ্জনায় একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছে। বাংলা কাব্য বা কবিতার প্রস্তুতি পর্বে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা- সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সক্রিয় উদ্যোগে বাঙালির অংশগ্রহণ ও শিক্ষিত বাঙালির ইংরেজ ঘনিষ্ঠতা ও ব্যবহারিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য বা তৎপরবর্তী তর্জা ,আখড়াই, টপ্পা, পাঁচালীগানের গীতরচনা থেকে মুক্ত হয়ে লেখ্য কাব্যে অভিষিক্ত হয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিভিন্ন বাঙালি মনীষীদের সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতা। বাংলায় নবযুগের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় সমাজসংস্কারক হয়েও সাহিত্যের অঙ্গনেও নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন। পরবর্তীকালে ঈশ্বরগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন তাঁদের অতুলনীয় প্রতিভার মাধ্যমে বাংলা কাব্যজগতকে সমৃদ্ধ করেছেন। মুদ্রিত কবিতার দৃশ্যরূপও সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও উদ্দীপনার কারণ হয়েছিল। এই প্রেরণারই সুফলন হিসেবে রবীন্দ্রনাথের যুগন্ধর প্রতিভার স্ফুরন দেখা দেয়। তাঁর সর্বব্যাপী প্রতিভাকে কেন্দ্র করে বাংলা কাব্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সমগ্র বাংলা সাহিত্যজগত রবীন্দ্রবিরোধী বা রবীন্দ্র -অনুসারী হিসেবে দুটি অলিখিত ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। রবীন্দ্র- অনুসারী বা অনুগামীরা তাঁদের নিজ নিজ প্রতিভা অনুসারে কাব্য বা কবিতা রচনা করতে থাকেন। একটি গোষ্ঠী ইউরোপীয় সমাজচেতনা ও বাস্তবজীবন সম্বন্ধে উদার হয়, অপরদিকে রবীন্দ্র- অনুসারী বা অনুগামীরা তাঁদের নিজ নিজ প্রতিভা অনুসারে কাব্য বা কবিতা রচনা করতে থাকেন। আমাদের আলোচ্য কুমুদ রঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায় পুরনো ঐতিহ্য, প্রেম-প্রকৃতি-আদর্শ ও ভক্তির অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে আত্মনিবেদন করেছেন। সত্য -শিব- সুন্দর -এ বিশ্বাস, প্রকৃতির অনাড়ম্বর ও সজীব বর্ণনা, ব্যক্তিগত সুখ -দুঃখ, আশা -আকাঙ্ক্ষা, ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য ও সর্বোপরি অকৃত্রিম সারল্য ও মানুষের প্রতি নিঃশর্ত আস্থাবোধ এই অনুসারী কবিদের অন্যতম উপজীব্য বিষয়। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায় হলেও একদা ছাত্রপাঠ্য কবিতার সম্ভারে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন।

মূল প্রবন্ধ-

বাংলা কবিতায় পল্লীমুখী বাতাবরণ নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজে যখন পদ্মা-তীরবর্তী পল্লীগুলিতে বিচরণ করছিলেন, তখনই তাঁর কাব্য অসাধারণত্বের শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছিল- যা তাঁর কাব্যগুলিকে এক অভূতপূর্ব পরিণতি

প্রদান করে। এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ কখনই বিস্তৃত হননি। ফলস্বরূপ তাঁর কবিতায়, গল্পে, নাটকে পল্লীবাংলার জীবন ও প্রকৃতি বৈচিত্র্যময় সম্ভার নিয়ে অজস্র ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধু নদীমাতৃক বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলই নয়, রুক্ষ রাঢ়বঙ্গের ক্ষীণস্রোতা কোপাই ও বোলপুরের ভুবন ভাঙ্গার মাঠ এক অন্য তাৎপর্য ও মহিমা বহন করে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে। তাঁর তত্ত্বাবধানে সেখানে যে নতুন পল্লী গড়ে উঠলো, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিলেন 'শান্তিনিকেতন'। তা্ঁর প্রকৃতিতত্ত্ব, ঋতুতত্ত্বের মধ্যে পরিস্ফুট হল তাঁর আধুনিক চিন্তা ও অধ্যয়নের প্রতিফলন। বিহারীলাল প্রমুখ রোমান্টিকদের প্রভাবে যা কিছুতেই হতো না , রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তা হল - বাংলা কবিতায় পল্লী-প্রবণতার আবেগপ্রবণ ধারা একটা গুরুত্বপূর্ণ রূপে দেখা দিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রপ্রভাবের পাশাপাশি গান্ধীজীর ‘পল্লীতে ফিরে যাও’- আন্দোলনের ভূমিকাও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রানুজ কবিরা যেন পল্লী-বিষয়কেই কবিতার অপরিহার্য অঙ্গ বলে ভাবতে আরম্ভ করলেন। এঁদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন মল্লিক আজীবন নিজের গ্রামেই থেকেছেন এবং পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন আর কালিদাস রায় মূলতঃ নগরবাসী হলেও কবিতা রচনার ক্ষেত্রে পল্লীজীবনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ফলতঃ সাধারণ মানুষের জীবনে পল্লীজীবন ও গাছ-ফুল- লতা- পাতা- মাঠ-ঘাট নিয়ে পল্লীপ্রকৃতিও এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠল। এই সূত্রেই বাংলা কাব্যজগতের দুই পল্লীপ্রেমী কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায়ের কাব্যালোচনা বিস্তারিত অধ্যয়নের অবকাশ রাখে।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক বর্ধমানের শ্রীখন্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ছদ্মনাম কপিঞ্জল। রিপন কলেজ থেকে এফ.এ পাস করে সিটি কলেজে ভর্তি হন। ১৯০৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণপদকসহ বাংলায় বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কর্মজীবনে মাথরুন (বর্ধমান) নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশন-এর প্রধান শিক্ষক ছিলেন ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগতারিণী স্বর্ণপদক ও ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। রবীন্দ্র-অনুসারী কবিকুলের অন্যতম কবি প্রকৃতির রোমান্টিকতা, অজয়, কুনুর নদী অধ্যুষিত রাঢ় বাংলার প্রকৃতির প্রতি আন্তরিক প্রীতি, সহজ-সারল্য ও বৈষ্ণব ভাবুকতা তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল ‘শতদল’(১৯০৬), ‘বন তুলসী’(১৯১১), ‘উজানী’(১৯১১), ‘একতারা’(১৯১৪), ‘বীথি’(১৯১৫), ‘বীণা’(১৯১৬), ‘বনমল্লিকা’(১৯১৮), ‘নূপুর’(১৯২০), ‘রজনীগন্ধা’(১৯২১,) ‘অজয়’(১৯২৭), ‘তূণীর’ (১৯২৯), ‘চুনকালি’ (ব্যঙ্গ কাব্য ১৯৩০), ‘স্বর্ণ সন্ধ্যা’ (১৯৪৮), ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ (১৯৫৭), ‘দ্বারবতী নাটক’ (১৯২০), ‘মুখোশের দোকান’।

কবি কালিদাস রায় কুমুদরঞ্জনের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখেছিলেন—

যেথায় কুনুর তীর্থ রচেছে অজয় সঙ্গ লভি;

সেথা আশ্রম রচি’ জপ করে এ যুগের ঋষি কবি।

তার সুখময় ভবনাশ্রয় অজয় করেছে গ্রাস

তবু তারে আরো ভালবাসে বারো মাস।

অজয়ের কলতানে

সে যে কেঁদুলির কমলাকান্ত পদাবলী শোনে কানে

নানুরের ঘাটে রামী রজকিনী আজিও কাপড় কাচে

তালে তালে তার ধ্বনি সে কবির কর্ণকুহরে নাচে।[১]

আধুনিক জীবনের জটিলতা, বস্তুগত ভোগ্যবস্তুর অপরিসীম আকর্ষণ, পারস্পরিক অসুস্থ প্রতিযোগিতা, বিরুদ্ধ ও ভারসাম্যহীন সাধারণ জীবন যখন জটিলতায় আক্রান্ত, তখন সহজ সরল দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন জীবনদর্শন প্রায় অসম্ভব বিষয়। এই সীমাহীন ভোগবাদের একটি ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। অবিচল পল্লীপ্রীতি, ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ, প্রত্যন্ত মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ সহানুভূতি তাঁর কাব্য-মানসিকতার পরিস্ফুট বৈশিষ্ট্য। তবে কুমুদরঞ্জনের অতীত-অনুবর্তিতা শুধুমাত্র প্রাচীন সংস্কৃতির জয়গান নয়, বাঙালি জীবনবোধের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন সত্ত্বেও নিজ অন্তরের সংস্কার ও বিশ্বাসে একেবারে আত্মমগ্ন। ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত জটিলতা ও প্রতিযোগিতা উপেক্ষা করে বাংলার শুচিস্নিগ্ধ ছায়ায় ঘেরা পল্লী জীবন তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা ও অভীপ্সাকে এমনই নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে রেখেছে যে সেটা তাঁর স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্র ও সহজ সরল মানসিকতার অনিবার্য পটভূমিকা রচনা করেছে। উজানী গ্রাম ও অজয় কুনুর নদী তাঁর দেহ ও মনের ভৌগোলিক ও আত্মিক সীমা নির্দেশ করে দিয়েছে। তাঁর মনের সমস্ত প্রয়োজন, তাঁর মনের ও ব্যক্তিসত্তার সমস্ত দাবি, এমনকি তাঁর হৃদয়বৃত্তির সমস্ত আকাঙ্ক্ষা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পেয়েছে।

পল্লীপ্রেম ও নিসর্গপ্রীতি কবি মাত্রেরই সহজ ও সাধারণ ধর্ম। এই বিষয়ে কুমুদরঞ্জন ছিলেন অদ্বিতীয়। স্নিগ্ধ, শান্ত পল্লীজীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ভাবুক মানুষের বাঞ্ছিত অনুভূতির স্পর্শ লাভ করেছিল। কুমুদরঞ্জনের স্বাভাবিক পল্লীপ্রীতির সঙ্গে তাঁর কবি মনোভাব এমন একাত্মতা লাভ করেছিল যে তিনি তাঁর আজীবন সাধনায় গ্রামের মায়ার ছায়াবটের স্নেহচ্ছায়ায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাই খুব বেশিদিন তিনি কখনও নিজের গ্রামের বাইরে থাকতেন না। প্রকৃতিচেতনা ও শান্তিসৌন্দর্যের নীরব মাধুর্য বিশেষ করে তাঁর গ্রামের প্রতি ভালবাসার নির্ভেজাল প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়--

"বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে,

জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।

সামনে ধূসর বেলা জলচরের মেলা

সবুজ গ্রামের ঘর দেখা যায় তরুলতার ফাঁকে।"

(আমার বাড়ি, কুমুদরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

কুমুদরঞ্জনের বৈশিষ্ট্য এই যে, আজন্ম পল্লীর আবহাওয়ায় জীবন অতিবাহিত করলেও বৈচিত্র্যহীন পল্লীজীবনের প্রতি কোন বিরাগ বা বিতৃষ্ণা পোষণ করেননি। পল্লীবাসীদের সর্বপ্রকার দুর্বলতাকে ক্ষমার চোখে উদার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। পল্লীপ্রীতি ছিল তাঁর জন্মগত সংস্কার। যে অজয় নদী তাঁর বাসস্থান গ্রাস করেছিল, সেই অজয় নদীর উপর ছিল তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ। প্রতি বছর অজয়ের দুই তীর জুড়ে যে বন্যা-প্লাবন বিধ্বংসী রূপ নেয় সেই নদীর প্রতি তাঁর মহত্ব অনিবার্য প্রীতির জন্ম দেয়।

"আমি ভালোবাসি দিগন্তব্যাপী বন্যার অভিযান,

গুরু তার কলকল্লোলে পাই অকূলের আহ্বান।

ফণা প্রসারিয়া চলে অনন্ত, ভাম তরঙ্গে নাচে,

যেন গ্রীক সেনা লয়ে দর্পে আলেকজান্ডার ছুটিয়াছে।

এসেছে পাহাড়ি বন্যা, এসেছে বন্যা ভুবন জোড়া -

চলে তৈমুরলঙের বাহিনী ছুটাইয়া লাল ঘোড়া।

শত গৈরিক পতাকা উড়ায়ে ঝঞ্ঝার মত আসে-

শিবাজীর চতুরঙ্গ বাহিনী ভৈরব উল্লাসে।

ভেসে যায় কত, ডুবে যায় কত গলে যায় কত কি যে,

জলরাজ্যের 'ওয়াটারলু' ও জেনা অস্টারলিজে"![২]

কুমুদরঞ্জন দার্শনিক কবি নন, কিন্তু তাঁর কবিতায় এক বিশেষ জীবনদৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। অতীত কীর্তির গুণগান করে কবিরা সবসময় অনুপ্রাণিত হন না। একটি দেশাত্মবোধক কর্তব্যবোধ তাঁদের লেখনিকে অল্পাধিক পরিমাণে প্রভাবিত করে। তাঁদের জীবনযাত্রার যে আদর্শকে অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে করেন, তার উৎসমূলে পৌঁছতেই তাঁদের আগ্রহ স্বাভাবিক। এই অভিযাত্রায় প্রেরণা যতটা পথপ্রদর্শক হয়, কবিকল্পনা তত প্রখর হয় না। ইতিহাসবোধ ও ভৌগোলিক কৌতূহলই এই মানসিকতার মধ্যে ইতিহাস-চেতনার জন্ম দেয়। যেমন-সোমনাথের মন্দির বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিদেশি পর্যটক ও বৈদেশিক ধনলোলুপ দুষ্কৃতীর দ্বারা

সম্ভ্রম ও বিস্ময় বোধ জাগিয়ে তুলেছিল। বিভিন্ন সময় এই মন্দির বিদেশী শাসক দারা লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এ কথা ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু "আলবিরুনীর সোমনাথদর্শন" কবিতাটিতে বিস্ময় বা কৌতূহল নয়, এই কবিতায় তিনি নিজের ভক্তিপ্রসূত মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন। তিনি ধর্মের যে সত্য উপলব্ধি করেছেন তাই কবিতায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতার যে মূল সুর তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে তিনি দরিদ্রা পল্লীলক্ষ্মীকে ইতিহাসের ছিন্নখন্ড মসলিনের টুকরোয় রাজবেশের বহুমূল্য স্বর্ণ খচিত জরির প্রান্ত দিয়ে প্রসাধন সজ্জায় সজ্জিত করেছেন।[৩]

"তারা বলে এই গোটা বিশ্বের সবটুকু ভগবান ,

সর্বময়ের সঙ্গে শিলার কেন রবে ব্যবধান।

পাথর যে নয় দেবতা, তাহা তো হীন জন্তুও জানে,

পাথরে দেবতা দেখে যারা, তারা বহু উন্নত জ্ঞানে।

ভাব ভূয়িষ্ঠ মন ইহাদের, বুকে অমৃতের ক্ষুধা

পাষাণ নিঙাড়ি ভক্তচকোর বাহির করিবে সুধা।"[৪]

এই কবিতায় শুধু যে দেবতত্ত্বের বা মূর্তিপূজার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন তা নয়, আধ্যাত্মিক বা ধর্ম জীবনের কথাও বলেছেন। কুমুদরঞ্জন ধর্মের যে সত্য নিজের বিশ্বাসে অনুভব করেছেন, তাই ই কবিতায় প্রকাশ করেছেন। বস্তুত: কবিতাকে নিজের উপলব্ধিতে ভাবে ও ভাষায় উৎকৃষ্ট স্তরে উপনীত করেছেন। আবার 'মেগাস্থিনিসের সোমনাথ দর্শন' কবিতায় তাঁর বিদগ্ধ মনে ইতিহাসাশ্রয়ী একটি নিভৃত ভাবের উদয় হয়, তখন তিনি চমকপ্রদ অলংকার ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেছেন। মেগাস্থিনিস সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসেন ও পরিব্রাজকরূপে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে 'ইন্ডিকা' নামে গ্রন্থ লেখেন। তাঁর মত পন্ডিত গ্রীক পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে সোমনাথ মন্দির দর্শনের পর এক বিশালতা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আলোচনা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

"চূড়াগুলি সব স্বর্ণময়

সুবর্ণ পরশ উর্ধ্বে জেসন কি করেছে সঞ্চয়?

সংগীত ও শ্রুতপূর্ব সুধাস্যন্দি গম্ভীর মহান

পাষান ভিতরে যেন অরফিউস গাহিতেছে গান

অনন্ত অম্বরে উঠি স্বর্গ মর্ত্য করে সমন্বয়

সুঠাম পেশল দৌবারিক

যেন সত্য হারকিউলিস দাঁড়িয়ে রয়েছে নির্নিমিখ।"[৫]

শুধু দেশাত্মবোধ বা ইতিহাসপ্রীতি নয়, আজন্ম পল্লী-প্রকৃতিপ্রেমী কবি নারী, মাতা ও জন্মভূমির প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল। পত্নীপ্রেম বা যুগল মিলনের রসপিপাসাকে অতিক্রম করে এই প্রীতিরস তাঁর কাব্যে তীব্র গভীর অথচ সরল ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। 'দারিদ্র্যের মৃদুগর্বে চরিত্র সুন্দর' এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী কবি বণিতার রূপ বর্ণনা করেছেন নিরাভরণ সহজ সরল আড়ম্বরহীন সলজ্জ বধূর রূপে-

"অষ্টাঙ্গেতে নাইকো কোথাও অষ্টরতি সোনা ,

পরনেতে রাঙা পেড়ে শাড়ি তাতের বোনা।

পা দু'খানি আলতা রাঙা, পাড়া গেঁয়ে মেয়ে;

নাইকো তাহার গয়নাগাঁটি নাইকো ভালো বেশ,

অমার্জিত রূপটি তাহার, অসংযত কেশ।

যদি বা কয় দু-এক কথা-শুনে কথার টান,

হাস্য করে অন্য সবে, রয়েছে ম্রিয়মাণ।"[৬]

এই হল কবির গৃহিণীর শাশ্বত রূপ যেখানে বাঙালি নারীর চিরন্তন রূপের মধ্যে গৃহিনী তথা বিশ্ব জননী বা মায়ের প্রতীকি রূপ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

"মাগো আমার পুণ্যময়ী তুমিই আমার জগন্মাতা,

জনম জনম পেলাম তোমার এই করুণা, এই মমতা।

গুল্ম হয়ে, বসুন্ধরে, স্তন্য তোমার টেনেছি গো,

তারা হয়ে নীলিমা, তোর বুকের দরদ জেনেছি গো।

চাতক হয়ে তোমায় আমি কাতর হয়ে ডেকেছিলাম,

পূর্ণিমা তোর সুধার আদর চকোর হয়ে চেখেছিলাম।

দোলনাতে মা জনম জনম তুমি আমায় দোল দিয়েছো

আমি যখন কুসুম-কোরক, লতা হয়ে কোল দিয়েছো।

জনম জনম মা হয়েছ-জনম জনম হবেও মা,

ডাকবে আমায় স্তন্য তোমার, তোমার কাজল, তোমার চুমা।[৭]

নারী, প্রেম, মাতা ও দেশমাতৃকা সব যেন এই কবিতায় এক সূত্রে গ্রন্থিত হয়ে গিয়েছে। জননী, জন্মভূমি শুধু কবিতার রূপকল্প নয়, বিশ্ব জননীর আধারে স্থাপিত একটি চিরকালীন আকাঙ্খার প্রতিমূর্তি।

সমাজের প্রান্তিক মানুষের প্রতিও কবির দৃষ্টি প্রখর ছিল। 'চন্ডালী' কবিতায় এক বৃদ্ধ খন্ড চন্ডালী জগন্নাথের রথ দেখতে পুরীধামের দিকে যাত্রা করে। সবল সমর্থ্য জনসাধারণ সহজেই পথের বাধা দূর করে জগন্নাথ ধামে পৌঁছে যায়, কিন্তু বৃদ্ধা অশক্ত শরীরে শেষ অব্দি পৌঁছাতে পারেনা। আশ্চর্যের বিষয়, জগন্নাথের রথ মহা সমারোহে গুণ্ডিচা বাড়ির দিকে যাত্রা করলেও পথে রথ যাত্রায় বিঘ্ন ঘটে। প্রধান পান্ডা ধ্যানে জানতে পারলো যে এক অশক্ত ভক্ত বৃদ্ধা পুরীধাম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। তাই মহাপ্রভুর রথযাত্রা বিঘ্নিত হয়েছে। পান্ডা ভক্তকে অনুসন্ধান করে রথের সম্মুখে নিয়ে তাঁর হাতে রথের রশি দিতেই রথ চলতে শুরু করল। এক চন্ডালী বৃদ্ধার রথের রশিতেই ভক্তের ভগবান জগন্নাথ সাড়া দিলেন। ---

চকিতে দেখিল যাত্রীরা সবে

জয় জয় জয় বলে

প্রধান পান্ডা আসিল রে ভাই

খোঁড়া বুড়ি লয়ে কোলে

অচল সে রথ চলিতে লাগিল

বুড়ি যবে দিল হাত

উল্লাসে সবে গাহিয়া উঠিলো

ধন্য জগন্নাথ !

সাশ্রু নয়নে অযুত কণ্ঠে

গাহিল অযুত প্রাণ

সত্যই তুমি কাঙালের হরি

ভক্তের ভগবান।[৮]

কুমুদরঞ্জনের কাব্যে যা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গুণ সেটি হল আন্তরিকতা। সহজ, সরল, নির্ভেজাল সুকুমার মানবিকতা। তাঁর একাধিক কাব্যগ্রন্থের যেকোনও একখানি নিয়ে আলোচনা করলেই বোঝা যাবে সহজ সাবলীল গতিতে, স্বাভাবিক ছন্দে ও উজ্জ্বল কল্পনার মন্দাকিনীধারা নানাভাবের বিচিত্র লহরী তুলে ছুটে চলেছে। জড়তাহীন আত্মপ্রত্যয়ে অকুতোভয়।রূপক-আলঙ্কার-ছন্দ নিয়ে কোন অসম পরীক্ষা নিরীক্ষা নেই। তাঁর কবিহৃদয়ের অন্তর্নিহিত প্রধান সুরটি হল অমৃত সন্ধানী উচ্চকোটির বৈষ্ণব সাধকের দিব্যানুভূতি-জাত ভাবাবেশ। আবার তারই মধ্যে দেশের অতীত গৌরব, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, দুঃখ-দারিদ্র্য, সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখেন। মানবিকতা গুণেরও কোনও কমতি নেই। তাই তাঁর কাব্যে বাঙালির চিরকালীন প্রকৃতি-প্রেম-আশা-আকাঙ্ক্ষা গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর কাব্য নিয়ে খুব বেশি আলোচনাও হয়নি। তাই অধুনা-বিস্মৃত এই কবির কাব্যসাধনা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা, একান্ত প্রয়োজন।

রবীন্দ্রানুসারী অথচ স্বতন্ত্র ধর্মবিশিষ্ট কবিগোষ্ঠীর অন্যতম কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) প্রাচীন ভাবাদর্শে বিশ্বাসী। সার্বভৌম মানবরসের উদ্বোধক ও অলংকারবহুল ভাষায় অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে আন্তরিক বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন কবি। কাব্যে অনন্য প্রতিভার জন্য তাঁকে "কবিশেখর" উপাধি দেওয়া হয়। ১৮৮৯ সালের ৯ই জুলাই বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখন্ডের নিকটবর্তী করুই নামক গ্রামে কবিশেখর কালিদাস রায় জন্মগ্রহণ করেন। একটি বৈষ্ণব ভাবমন্ডিত পরিবারে ও পল্লীগ্রামের অনাবিল সৌন্দর্য ও সারল্যের মধ্যে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে ধর্মবিশ্বাস, বৈষ্ণবীয় রসমাধুর্য, ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, সর্বোপরি মানবতাবাদে বিশ্বাসী এই শিক্ষক-কবি কোনওরূপ অনুশীলন ব্যতীতই সহজাত প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন।

কালিদাস রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর শিক্ষকতা করেছিলেন। এই বৃত্তি অন্যান্য কবিদের মধ্যে থাকলেও তিনি প্রথম শিক্ষক-কবি যিনি একাধারে দক্ষ ও আদর্শবাদী শিক্ষক ও সুনিপুণ কবির একত্র মিলন একমাত্র তার মধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছিল। স্বনামধন্য অভিনেতা বিকাশ রায়, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কিংবদন্তি গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর মিত্র ইনস্টিটিউশনে (ভবানীপুর) শিক্ষকতাকালে

ছাত্র ছিলেন। বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করবার ফলে জীবন ও ছাত্রজীবন সম্পর্কে তাঁর যে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল, 'ছাত্রধারা' কবিতাটির মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে[৯]

"বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠ তলে

চলে যায় তারা কলরবে

শৈশবের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়

যৌবনের শ্যামল গৌরবে।[১০]

শিক্ষক জীবনের স্মৃতি বার্ধক্যেও তাঁর মনকে ব্যথাতুর করে রেখেছে।

"আর সব গেছি ভুলি, ভুলিনি এ মুখগুলি

একবার মুদিলে নয়ন,

আঁখিপাতা ভারি ভারি ম্লান মুখ সারি সারি

আকুল করিয়া তোলে মন।"[১১]

এ সম্পর্কে কবির নিজস্ব মতামত- "ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা যেমন আমার কবিতার প্রধান উপজীব্য, ছাত্রজীবনের অধ্যয়নও তেমনি আমার বিদ্যাবুদ্ধির প্রধান সম্বল।"[১২]

আজীবন শিক্ষাব্রতী কালিদাস রায় যে কত ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাময় বীজকে অঙ্কুরিত করে বিশাল মহীরুহে পরিণত করেছিলেন তার পরিমাণ অজ্ঞেয়! তিনি ছিলেন সৎ, ছাত্রবৎসল, কর্তব্যনিষ্ঠ, স্বল্পে তুষ্ট শিক্ষাব্রতী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে শিক্ষা বিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে একদিকে যেমন ছাত্রদের প্রতি কবির গভীর সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনই শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্তব্য ও জ্ঞানেরও পরিচয় নিহিত আছে।

"বহু ছাত্রদের মধ্যে এমন শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে যা সুবিচারের সহিত নিয়ন্ত্রিত, উন্মেষিত ও পরিচালিত হলে তারা আদর্শ ছাত্র হতে পারে। মাত্রাজ্ঞানের অসংযম অভাবও বহু ছাত্রকে বিপথে চালিত করেছে। যাতে তাদের মধ্যে মাত্রাজ্ঞান ও সামঞ্জস্যবোধ জন্মাতে

পারে ও জীবন সংযত ও সংহতভাবে পরিচালিত হয় সেদিকে কোন চেষ্টা না করে কেবল ছাত্রদের দোষ দেওয়া অসঙ্গত বলে মনে করি।"[১৩]

এই আত্মভোলা দরদী শিক্ষক শুধুই যে শিক্ষাব্রতী ছিলেন তা নয়, তাঁর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত কবিমনের সত্তাটিও ছিল। মিত্র ইনস্টিটিউশন স্কুলে থাকাকালীন তিনি "মৈত্রী" নামে একটি স্কুল ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। এতে ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল ও ছাত্ররা তাঁর প্রতি এজন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করত।

বিদ্যালয়ে পড়বার সময় থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। বিদ্যালয়ে পড়বার সময়ই তিনি যে কবিতাগুলি লিখেছিলেন তা "কুন্দ"(১৯০৭) নামে একটি কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করেন। এই কাব্যগ্রন্থটি তিনি রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন। এই কাব্যটির জন্য বিশ্বকবির আশীর্বাদও লাভ করেন। তাঁর ছাত্রাবস্থায় রচিত প্রথম ব্রজলীলার কবিতা "বৃন্দাবন অন্ধকার" "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হয়। এরপর মর্মবাণী, উত্তরা, বিশ্ববাণী, শনিবারের চিঠি, প্রবাসী, মানসী, কণিকা, উপাসনা, ভারতী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁর কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। এছাড়া হেমেন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত "আর্যাবর্ত" পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তিনি কবি-দার্শনিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বিশ্বপতি চৌধুরী, ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় ও কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। প্রথম জীবনে তাঁর কবিতায় ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব অনুভূত হয়। কবি ধীরে ধীরে এই প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব রীতি ও বৈশিষ্ট্যে শ্রীমণ্ডিত হয়েছিলেন। যেসব পন্ডিতবর্গ ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সাহচর্য তিনি লাভ করেছিলেন তার মধ্যে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শিশির কুমার ভাদুড়ি, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ঘোষাল, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত. দীনেশচন্দ্র সেন, অশ্বিনী কুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, শশাঙ্ক মোহন সেন, বিজয় চন্দ্র মজুমদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ সালে তিনি রংপুর সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে "কবিশেখর" উপাধি লাভ করেন।[১৪]

১৯১৩ সালে তার "পর্ণপুট" প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। এরপর একে একে ‘বল্লরী’, ‘চিত্তচিতা’, ‘পর্ণপুট’. ২য় খন্ড, ‘ক্ষুদকুঁড়া’, ‘হৈমন্তী’, ‘বৈকালী’, ‘তৃণমূল’, ‘গাথাঞ্জলি’, ‘গাথামঞ্জরি’, ‘গাথাকাহিনী’, ‘রসকদম্ব’, বইগুলি প্রকাশিত হয়। এরপর ‘সন্ধ্যামণি’, ‘লঙ্কেশ্বর’, ‘আহরণ’, ‘আহরণী’, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ সর্বশেষে ‘শেষ আহুতি’, ‘পূর্ণাহুতি’ প্রকাশিত হয়।

তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'বল্লরী' কাব্যগ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যগ্রন্থখানি তৎকালীন বিদ্বান সমাজের কাছে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। কবিতাগুলির ভাব ও ভাষা সরল, স্নিগ্ধ, রমণীয় ও ছন্দের ঝংকারে অত্যন্ত মনোগ্রাহী।

কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। গীতগোবিন্দ

(অনুবাদ), চণকসংহিতা, পদাবলী সাহিত্য, সাহিত্য প্রসঙ্গ(২য় খন্ড), চালচিত্র ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি আলোচনাচক্র গড়ে উঠেছিল, তার নাম ছিল "রসচক্র"। কবির তৎকালীন গৃহ কালীঘাট পার্কের কাছেই ছিল। সেখানেই বৈঠকে চা পান, গল্প গুজব ও সাহিত্য আলোচনা হতো। বহু প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও কবি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি নজরুল ইসলাম ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই রসচক্রের সদস্য ছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই রসচক্রের সভাপতি হয়েছিলেন।

১৯৫৯ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিনি "নবীন সেন" সম্বন্ধে বক্তৃতাদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। তাঁর সাহিত্যিক কীর্তির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ১৯৫৩ সালে "জগত্তারিণী স্বর্ণপদক" ও "সরোজিনী স্বর্ণপদক" দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে "লীলা লেকচারার" হিসেবে মনোনীত করেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী বর্ষে তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত "নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য" সম্মেলনে মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. এল. রায় সম্বন্ধে লেকচার দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৯৬৩ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা সেই বছরের শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে তাঁকে "আনন্দ" পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯৬৮ সালে তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ "পূর্ণাহুতি" কাব্যের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯৭০ সালে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে তাঁকে "দেশিকোত্তম" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৭২ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি. লিট' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে। ১৯৭৫ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি. লিট' সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ শে অক্টোবর শনিবার রাত্রিতে তিনি তাঁর টালিগঞ্জের বাসভবন, 'সন্ধ্যার কুলায়'- এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কালিদাস রায়ের কাব্য আলোচনাকালে একটি বিশেষ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শ শিক্ষক, নীতি-নিষ্ঠা ও আদর্শবোধে বিশ্বাসী কবির শিক্ষক রূপটি বারংবার কাব্যমধ্যে উন্মোচিত হয়েছে। কোথাও কোথাও তাঁর কবিসত্তা শিক্ষকসত্তার সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। বহু পঠিত "ছাত্রধারা" কবিতাটির ছত্রে-ছত্রে কবির কবিসত্তা শিক্ষকের আদর্শবোধকে কাব্যপ্রীতির সঙ্গে এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছে।

"কেহ বা ক্ষুধায় ম্লান, কেহ রোগে ম্রিয়মাণ,

শ্রমে কারো চাহনি করুণ,

কেহ বা বেত্রের ডরে বন্দী হয়ে রয় ঘরে,

নেত্র কারো তন্দ্রায় অরুণ।" (ছাত্রধারা)

ছাত্রধারা'র কবি সুখে- দুঃখে- বেদনায় ভরা শিক্ষকজীবনের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেও যে ছাত্রধারা বর্ষে বর্ষে দলে দলে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় কবির জীবন সৈকতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তাঁর সজীব সংস্পর্শে শ্যামল ও সরস হয়ে উঠেছেন।

"এ জীবন ভেঙ্গে গড়ে শ্যামল সরস করে

ছাত্রধারা বহে চলে যায়।"

তাঁর অনেক কবিতার মধ্যে কপটতা, ভন্ডামি, বঞ্চনা, শঠতা, অন্যায় প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। নীতি – আদর্শবোধ, নির্মল সাহিত্য রচনা প্রভৃতি মহৎ গুণ তাঁর কাব্যের আধার হয়েছে।

" তোমার সত্য ভাণ্ডার দ্বার খুলে দাও খুলে দাও

ভবের ভীষণ তমসার পানে জ্যোতি নয়নে চাও।

তোমার সত্য শাশ্বত দ্বীপ ধরো তুমি ধরো তুলে।" (শাশ্বত সত্য, বল্লরী)

পাঠকের মনেও তিনি সত্যের শাশ্বত দ্বীপ জ্বালাবার চেষ্টা করেছেন। যে শিক্ষার দীপালোক শত বিপর্যয়েও অটুট থাকে। আশৈশব পল্লী বাংলার সঙ্গে গভীর ও নিবিড় যোগাযোগ থাকায় তাঁর কবিতায় পল্লীবাংলার রূপটি অনাবিল সৌন্দর্যের অধিকারী হয়ে ধরা দিয়েছে। তিনি ছিলেন পল্লী মায়ের দরদী সন্তান। পল্লীর মাটি, জল, বাতাস, রূপ, রস, গন্ধের সঙ্গে তাঁর ছিল নাড়ির যোগ। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ শিশুকাল থেকেই তাঁর মনে গভীর কৌতূহলের সৃষ্টি করত। শৈশবের সেই বিস্ময় ও কৌতূহল স্মরণ করে পরিণত বয়সে একটি কবিতা লেখেন—

"অবাক করিত মোরে

কেমনে শীর্ণ ঝিঙের লতাটি ফুলে ফুলে গেল ভরে

সেদিনের লতা কোথা হতে এত হলুদিয়া রং পায়

সবুজ কেমনে হলুদ হইয়া খড়ের চালাটি ছায়

বিকেল বেলার হলুদিয়া রোদ করি পান তার হাসি

ফুটে কি উঠিলো চালাটি ভরিয়া ফুল হয়ে রাশি রাশি

অবাক করিত মোরে।" (সন্ধ্যামণি, বাল্য স্মৃতি)

কালিদাস রায় একান্তভাবেই প্রকৃতিপিপাসু কবি। গ্রাম-বাংলার মেঠো পথ- ঘাট ,দিঘী, হাসপাতাল ছায়া সুনিবিড় গাছপালা সমস্তই তাঁর চোখে মায়াঞ্জন পরিয়ে দিয়েছে। কবি পল্লীর অপূর্ব শ্রী আকণ্ঠ পান করেছেন।

"পথখানি জল থেকে চলিয়াছে এঁকেবেঁকে

আম্রবন হইয়াছে পার

ঘট কাঁধে আসে বধূ নব মুকুলের মধু

বিন্দু বিন্দু ঠোঁটে পড়ে তার

পাকুড়ে বাদুড় ঝোলে তালগাছ হতে দোলে

সারি সারি বাবুয়ের বাসা

কোথায় বাতাবি ফুল গন্ধে বন মশগুল

হেথা হতে তৃপ্ত হয় নাসা" (পল্লীশ্রী, হৈমন্তী)

এই পল্লীপ্রীতি তাঁর বহু কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কাশিম বাজারে থাকাকালীন প্রতিদিন যে পথে বিদ্যালয়ে যেতেন সেই পথের বর্ণনায় তিনি অপরিসীম কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। "এতে আমি আমার কল্পনার সঙ্গে প্রতিদিন খেলা করবার অবসর পেতাম।"[১৫]

কালিদাস রায় ছিলেন ভারতীয় সভ্যতা ও বঙ্গ সংস্কৃতির যথার্থ ধারক ও অকৃত্রিম শিল্পী -কবি। তাঁর রচিত গাথাকাব্যগুলি যেমন- গাথামঞ্জরী, গাথাকাহিনী ও গাথাঞ্জলি -এই পর্যায়ের উদাহরণ। ধর্মে আস্থা, ভক্তি, ত্যাগ, তিতিক্ষা, মৈত্রী, ক্ষমা, প্রীতি -অতীত ভারতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ তিনি তাঁর কাব্যে রূপদান করতে চেষ্টা করেছেন। এই জাতীয় কবিতার মধ্যে ‘ত্রিরত্ন’, ‘অম্বরীষের

যজ্ঞ', 'কৃষ্ণার প্রতিহিংসা', 'সাধু একনাথ', 'বাল্মীকি মুচি', 'উপপলা ও পটচারা' প্রধান। এগুলিতে মানব চরিত্রের মহত্ব ও মাহাত্ম্যের এক একটি আদর্শকে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই জাতীয় কবিতার মধ্যে "গঙ্গা" অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গা নদীকে আশ্রয় করেই ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল। গঙ্গা, আর্য সভ্যতার ধারাকে বহন করে চলেছে। তাই গঙ্গা, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক। গঙ্গাকে তিনি বর্ণনা করেছেন বৈদিক ঋষির ন্যায় উদাত্ত সুরে—

"নমি সনাতনী সারাৎ সারা।
অতীতের সাথে ভবিষ্যতের যোগবন্ধন তোমার ধারা
তুমি তরলিত সৃজন কামনা, বিধি ভৃঙ্গার কুহর হতে
কবে বাহিরিলে সৃষ্টির পরমেষ্টি বিভূতি ভাসায়ে স্রোতে" (গঙ্গা, গাথাঞ্জলি)

হিমাদ্রি, বরুণ, অশ্বত্থ প্রভৃতি কবিতায় ভারতীয় সংস্কৃতিতে ও পুরাণে কবির যে সুগভীর জ্ঞান ছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ভারতীয় সংস্কৃতির একটি শাখা হল ভারতীয় ধর্মবোধ ও দেব-দেবীগণ। গোপাল, মহাদেব, নারায়ণ প্রভৃতির বর্ণনায় চিরাচরিত বর্ণনার পরিবর্তে কবি স্বকীয় কল্পনায় তাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। এছাড়া 'ঋতুমঙ্গল' কাব্যে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেরও চিহ্ন রেখেছেন। তাঁর জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুবাদ, কাব্যে শকুন্তলা, কুমার সম্ভব, ইন্দুমতী প্রভৃতি কাব্যাংশ অনুবাদ বাংলা সাহিত্যে বিরল প্রতিভার নিদর্শন রেখেছে।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গীতিকবিতার যে ধারা বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন প্রভাব বিস্তার করেছিল তাতে দাম্পত্যপ্রেম বা গার্হস্থ্যপ্রেমের ভূমিকা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় কুমার বড়াল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, গোবিন্দ চন্দ্র দাস প্রভৃতি কবিগণের গীতিকাব্যেও দাম্পত্য প্রেম বা গার্হস্থ্য প্রেমই বিচিত্র রূপে দেখা দিয়েছে। এই কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্র অনুগামী হয়েও প্রেম অনুভূতির বিচিত্র ও সূক্ষ্ম স্তর ও ভাব কল্পনার জগতে বিশেষত্ব রেখেছেন। প্রেমের দেহাতীত ও অতীন্দ্রিয় রূপ এবং অনন্ত সত্তা অনুভব করার পরিবর্তে গার্হস্থ্যপ্রেমেই তাঁরা আস্থা রেখেছেন। কবিশেখর সামাজিক সম্পর্কের বাইরে প্রেমকে স্বীকার করেন না, তার কারণ পল্লী পরিবেশে গঠিত একটি ভক্তি নম্রচিত্ত আদর্শবোধ ও সামাজিক সংস্কারে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। গৃহের লক্ষ্মীই তাঁর আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদা, অতি সাধারণ রূপই তাঁর কাম্য- এই আটপৌরে রূপের প্রতিই তিনি আকর্ষণ অনুভব করেন। তাঁর কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে তা গার্হস্থ্য রসে রসসিক্ত। পারিবারিক জীবনের স্বার্থহীন ভালোবাসা ও প্রণয় মুগ্ধতায় তিনি

প্রেমের উজ্জ্বল, মধুর ও কল্যাণময় রূপটি অনুভব করেছিলেন। তাঁর কাব্যে দাম্পত্য জীবনের অপূর্ব রসবৈচিত্র্য দেখতে পাই। যৌবনের তরুণ মনের মুগ্ধতার পরিচয় অনেক কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়। "হ্যাঁ ও না" কবিতায় দেখি যৌবনের প্রেমের আবেগে কবির স্বগতোক্তি —

"সে মুহূর্তকালের গগনে

সন্ধ্যাতারা হয়ে জ্বলে আজো মোর প্রেমের স্বপনে

দুটি প্রশ্ন করেছিনু একটিতে বলেছিল হ্যাঁ অন্যটিতে না

এর বেশী কোন কথা বলো নাই, পথের সম্বল

হইল তা, যে তারা দুই কানে দুইটি কুণ্ডল।

দুটি একাক্ষরী শব্দ মনারম্ভে ওঁ হ্রীং সম সঞ্চারিলো শক্তি গূঢ়তম

বিনা অগ্নিশিখা, তাহাতেই হয়ে গেল

আমাদের সত্য কুশণ্ডিকা। (হ্যাঁ ও না-,আহরণ, পৃ-৯)

গার্হস্থ্য পরিবেশে ও প্রেমকে কতখানি মনোরম করে তোলা যায় তার বর্ণনা আছে এই কবিতায়।

"নতুন হয়েছে বিয়ে ঘোরেনি বছর

তখনো রোজই রাতে মোদের বাসর।

দিনে তুমি সংসারের পরিচারিকা

নিশীথ কুঞ্জে মোর অভিসারিকা।

চমকাতো বিদ্যুৎ ধমকাতো মেঘ

ভাঙ্গাতো তোমার মন সভয় আবেগ।

মেঘের ডাকের কি যে আসল মানে

নবদম্পতি ছাড়া কেই বা জানে?

নতুন প্রেমের হয়ে চির পরিবেশ

মনে হতো এ বরষা হোক না অশেষ।" (অভিসারিকা)

এই গার্হস্থ প্রেমের মধ্যে কোন সুদূরের ব্যঞ্জনা নেই সত্যি, তবে জীবনের শৃঙ্খলার মধ্যেই কবি প্রেমাভিসারে কল্পনা করেন মানসনেত্রে।

কালিদাস রায়ের প্রেম- বিষয়ক কাব্যের বিশেষত্ব এই যে প্রেমে আদর্শবাদ, স্থিতিশীলতা ও প্রেমের মঙ্গলময় দিকটিই অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। গার্হস্থ্যজীবনের সুখ –দুঃখ, আশা –আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য বেদনা ও প্রাত্যহিকতার গণ্ডির মধ্যে প্রেম সীমাবদ্ধ হলেও কবি সুদূরে অন্বেষণ করতে চেয়েছেন। তবুও প্রেমকে আপন উদ্দামতার পথে সীমা অতিক্রম করতে দেননি। পারিবারিক জীবনের গণ্ডির মধ্যে আবর্তিত করেছেন। তাঁর কাব্যে প্রেম অগ্নিশুদ্ধ গার্হস্থ্য-প্রেম; ভোগ-তৃষ্ণার বস্তু নয়। তার চিন্তা ধারায় প্রেমের অনুভূতি জীবনে অনেক বৃহৎ সার্থকতার সোপান হতে পারে।

ব্যক্তি-প্রশস্তিমূলক কবিতার মধ্যে যেমন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের কবিতা আছে, তেমনই দেশের বলিষ্ঠ নেতা ও কবিদের নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন। তিনি কবীর, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ, যীশুখ্রীষ্ট, রামমোহন, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস এবং ইংরেজ কবি কিটস্, শেলী, ব্রাউনিং, শেক্সপিয়র, টেনিসন সবাইকে নিয়ে প্রশস্তিমূলক কবিতা লিখেছেন। এই জাতীয় কবিতা রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। মহৎ ব্যক্তিগণকে যেভাবে তিনি বন্দনা করেছেন তাতে উপাদান সাধারণ হলেও ব্যক্তিগণের মাহাত্ম্য-বর্ণনায় স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। "বিবেকানন্দ" কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

"এক পারে অনাচার, ব্যভিচার, ক্লীবতা, মূঢ়তা,
ধর্মের দোহাই দিয়া মহাপাপ, খলতা, ক্রুরতা
শ্মশান -কুক্কুরসম ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে কোলাহল,
ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব বিদলিত আত্মার মঙ্গল।
অন্যপারে রাজসিক সভ্যতার উদ্ধত হুঙ্কার;
স্রষ্টারেও তুচ্ছ গণে বৈজ্ঞানিক দর্প করি সার,
ইহারে সর্বস্ব গণি আত্মার ভোগ শুধু চায়,

মাঝখানে দাঁড়াইয়া দীর্ঘশ্বাস তেয়াগিলে, বীর

গর্জিয়া উঠিলে বজ্রে, নেত্রে তবুও ধারাসারে নীর।

এই ভূ-সংসার হায়! এর মাঝে কোথা তব ঘর?

কোথায় জুড়াবে তব সে বিরাট ব্যথিত অন্তর?"[১৬]

কবির লেখনীতে বিবেকানন্দের যে চরিত্র-চিত্র এঁকেছেন তাতে তাঁর প্রকৃত রূপটিই ফুটে উঠেছে। এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে কবিহৃদয়ের শ্রদ্ধাজনিত চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে, আবার কবিতাগুলির সাহিত্যিক মূল্যও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তি প্রশস্তিমূলক কবিতাতে মননশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আবেগ ও চিত্তের স্পর্শকাতরতার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে। এই কবিতাগুলি শুধু ব্যক্তি-প্রশস্তি বা চরিত্রপূজা নয়, ছাত্র গণের চরিত্র গঠনেও পূজনীয় ব্যক্তিগণের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলা কাব্যধারায় অনুবাদ কাব্য একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কালিদাস রায়ও তাঁর ব্যতিক্রম নন। তিনি জালালুদ্দিন রুমী হাফিজ, জামী, শেখ সাদী প্রভৃতি পারস্য কবির কবিতা ও কবীর ও তুলসীদাসের হিন্দি থেকেও অনুবাদ করেছেন। পারস্য কবিগণের কাব্য থেকে কবি যে অনুবাদ করেছেন তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"তোমার পানে শর সম প্রভু অন্তর মম ছুটাও ছুটাও,

দিয়ো পানি বুলবুল আমার জীবন গুল ফুটাও ফুটাও।

দীপখানি রহি পাশে ম্লান হয়ে নিভে আসে শিয়র সমীপে,

চির ঊষালোক নিয়ে এস প্রিয় মমগৃহে, কি কাজ প্রদীপে?" (জালালুদ্দিন রুমী)

এই সকল কবিদের কবিতার ভাব চয়ন করে কবিতাগুলি সুন্দর ও সার্থক রূপে পরিস্ফুট হয়েছে। এভাবেই কবি বাংলা কাব্যের অনুবাদ শাখার সমৃদ্ধি সাধন করেছেন।

বাংলা কাব্যের ধারায় হাস্যরস একটি সহজাত বিষয়। অনেক কবি-সাহিত্যিক ব্যঙ্গরসকে সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। কালিদাস রায়ও হাস্যরসাত্মক কবিতা প্রচুর লিখেছেন, কখনও স্বনামে আবার কখনও "বেতালভট্ট" ছদ্মনামে। একটি অফুরন্ত হাসির কাব্যগ্রন্থ "রসকদম্ব"। এই গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে নির্মল হাসির আধার ও উপভোগ্য উপকরণ বর্তমান আছে। কবিতাগুলি শরতের মেঘের মতো হালকা ও লঘু বজ্রগর্ভ নয়। সামাজিক জীবনের নানা অসঙ্গতি ও বিসদৃশ বিষয় থেকেই এই ব্যঙ্গরাসের উৎপত্তি।

"কোথাও পোলাও পেলে দোষ কিছু দেখি না।

পাইলে পাঁঠার ঝোল জাত খোঁজ রাখি না।।

মুচি যদি লুচি দেয় খাই তাও আড়ালে।

শিবু সা'র দোকানেতে বেশি দেনা দাঁড়ালে।।

গোপনে অনেক খাই, জানে কোন শালা কি?

স্বীকার করিব তাই? পেয়েছ কি চালাকি?" (সমাজে, রসকদম্ব)

তাঁর অন্যমনস্ক, নস্যের গান, গিন্নির রান্না, নিজের কথা, কন্যাদায়োদ্ধার, অভিনন্দন, হিংসবিষ, অভিমত, গুরু চাই, মেসের পত্র, নৃত্য কালীর প্রতি ভজহরি, জুতা বদল, ভোজরাজ, নব পাঞ্চালীর প্রতি নব বৃকোদর কবিতাগুলি একাধারে হাস্যরস ও ভন্ডামীর শব্দ আবরণ সৃষ্টি করা ব্যক্তির প্রতি তীব্র কশাঘাত।

"সামাজিক জীবনের বহু প্রকারের কপটতা, ইতরতা, নীচতা ও আত্মম্ভরিতা লক্ষ্য করিলে চিত্তের প্রসন্নতা রক্ষা করা যায় না। অপ্রসন্নচিত্তে অবিমিশ্র রঙ্গরসের উন্মেষ হয় না। তাই প্রৌঢ় বয়সের রচনায় রঙ্গরস ব্যঙ্গরসে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের দিক হইতে ইহাতে লাভ হয় নাই বরং ক্ষতিই হইয়াছে।"[১৭]

বাংলা কাব্যে নারীর বন্দনা বা প্রশস্তি একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। বিভিন্ন কবির কাব্যে নারীর রূপ-গুণের বর্ণনা আছে। কালিদাস রায় বঙ্গনারী তথা ভারতীয় নারীর যে রূপ তাঁর কাব্যে অঙ্কিত করেছেন তা অতীব স্নিগ্ধ- মধুর ও গার্হস্থ্যধর্মী। নারীর মহিমা ও গৌরব তিনি উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় বর্ণনা করেননি বরং নিতান্ত ঘরোয়া ও গৃহলক্ষ্মী রূপেই বর্ণনা করেছেন। এই নারীরা

খনা, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি মহিমান্বিতা বিদূষী ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও মায়া-মমতা, দয়া, কোমলতা ও সেবাধর্মে বিশ্বাসী করুণায় গড়া এক একটি বিশেষ নারী মূর্তি। ---

"লজ্জা তাদের সজ্জা হয়ে কান্তি দিল দেহে,
সেবা তাদের ধর্ম ছিল, বিদ্যা ছিল স্নেহে।
হাতে তাদের তালের পাখা, ভরা কলস কাঁখে,
রান্নাঘরের ধোঁয়া তাদের রং দিল দুই আঁখে।
গৃহাশ্রমের তপস্বিনী তাদের তাপের ফলে
সভ্য বলে গণ্য মোরা হলাম ধরাতলে।" (প্রাচীনা পূর্ণাহুতি,পৃ-৩২)

মায়ের আহ্বান, তবু, গঙ্গার প্রতি, অরক্ষণীয়া, বৌ দিদি, পতিতা, বাংলার মেয়ে, পল্লী বধূ, কুটীরেশ্বরী, কল্যাণী, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি কবিতায় নারীর বিভিন্ন রূপের ও ভূমিকার কথা সশ্রদ্ধায় বর্ণনা করেছেন।

অকৃত্রিম মানবদরদী ও পল্লীপ্রকৃতির আন্তরিক কবি কালিদাস রায় নগরজীবনের অধিবাসী হয়েও পল্লীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কবিতার মাধ্যমে আদর্শবোধ, ধর্মচিন্তা, অসাধারণ ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও দার্শনিকের চক্ষু দিয়ে নির্বেদ দৃষ্টিতে এই জগৎ-সংসারকে দর্শন করেছেন। কবিশেখরের কালজয়ী প্রতিভা একটি অকম্পিত দীপশিখা যা অনেক ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও অবিচল থাকতে পারে। তাই অধুনা বিস্মৃত হলেও বাংলা কাব্যধারায় তাঁর কৃতিত্ব কখনোই ম্লান হবে না একথা বিশ্বাস করি।।

<u>গ্রন্থসূত্র-</u>

১) রায় কালিদাস, পৃষ্ঠা ভূমিকা

২) মল্লিক কুমুদরঞ্জন, পৃ. ১২৮

৩) বন্দ্যাপাধ্যায় শ্রীকুমার, পৃ. ৫- ৯

৪) মল্লিক কুমুদরঞ্জন, পৃষ্ঠা ৩৮

৫) দাশগুপ্ত রবীন্দ্রকুমার, পৃষ্ঠা ৮০- ৮২

৬) মল্লিক কুমুদরঞ্জন, পৃষ্ঠা ১৩৪

Research Through Innovation

৭) তদেব, পৃষ্ঠা ১৫৮

৮) তদেব, পৃষ্ঠা ২১৩

৯) রায় কালিদাস, পৃষ্ঠা ১৬

১০) তদেব, পৃষ্ঠা ১১২

১১) সান্যাল মঞ্জুশ্রী, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৫

১২) তদেব, পৃষ্ঠা ১১৬

১৩) রায় কালিদাস, পৃষ্ঠা ৫৯

১৪) সান্যাল মঞ্জুশ্রী, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪

১৫) রায় কালিদাস, পৃষ্ঠা ৫৯

১৬) তদেব, পৃষ্ঠা ৬৪

১৭) তদেব, পৃষ্ঠা ৫৮

গ্রন্থপঞ্জী

১) রায় কালিদাস। *কুমুদ রঞ্জনের শ্রেষ্ঠ কবিতার পরিচায়ক*। মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৮০।

২) মল্লিক কুমুদরঞ্জন। *শ্রেষ্ঠ কবিতা বন্যা স্বর্ণসন্ধ্যা*। মিত্র ঘোষ, কোলকাতা, ১৯৬০।

৩) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার। *কুমুদ কাব্য পরিচিতি প্রবন্ধ*। মিত্র ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬২।

৪) মল্লিক কুমুদরঞ্জন। *শ্রেষ্ঠ কবিতা আল বিরুণীর সোমনাথ দর্শন*। মিত্র ঘোষ, কোলকাতা, ১৯৬০।

৫) দাশগুপ্ত রবীন্দ্রকুমার। *মাঠের জলের জলতরঙ্গ (প্রবন্ধ)। কুমুদ কাব্য পরিচিতি,* মিত্র ঘোষ, ১৯০৭।

৬) মল্লিক কুমুদরঞ্জন। *মেঠো গান। বনমল্লিকা, শ্রেষ্ঠ কবিতা*। মিত্র ঘোষ, ১৯৬০।

৭) মল্লিক কুমুদরঞ্জন। *মাতৃস্তোত্র, স্বর্ণ, সন্ধ্যা, শ্রেষ্ঠ কবিতা*। মিত্র ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬০।

৮) মল্লিক কুমুদরঞ্জন। *চন্ডালী উজানী কাব্য*। শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৯।

৯) রায় কালিদাস। *ছাত্রধারা, কালিদাস রচনা সংগ্রহ*। মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬০।

১০) রায় কালিদাস। *আহরণী ছাত্রধারা কালিদাস রচনা সংগ্রহ*। কলকাতা, ১৩৩৩।

১১) সান্যাল মঞ্জুশ্রী। *বাংলা কাব্যে কালিদাস রায়*/ শাল্মলী পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০১।

১২) রায় কালিদাস। *স্মৃতি কথা*/ মন্দিরা পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ কলকাতা, ১৩৬৭।

১৩) রায় কালিদাস। *বিবেকানন্দ গাথাঞ্জলি*/ কালিদাস রায় কাব্য সংগ্রহ, কলকাতা, ২০২৩।

১৪) রায় কালিদাস। *রসকদম্বের ভূমিকা*/ শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৯২৫।

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation